শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত): একটি মূল্যায়ন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি উপাধি প্রাপ্তির শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত গবেষণা সন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষক

রিঙ্কু রায়

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. পায়েল বসু

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

কলা অনুষদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৩২

২০২৫

শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত): একটি মূল্যায়ন

গবেষণা অভিসন্দর্ভের গৃহীত পদ্ধতি

আমি আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে ভূমিকা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো পর্যন্ত যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছি তা হল বর্ণনামূলক পদ্ধতি। ভূমিকা, মূল আলোচনা-চারটি অধ্যায়, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি এই চার পর্বে গবেষণাপত্রটি সাজানো হয়েছে। গবেষণাপত্রটি আলোচনা সূত্রে তথ্যগত সাহায্যের জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিক উপাদান উপন্যাস ও ছোটগল্প সংগ্রহ করা হয়েছে যা এই অভিসন্দর্ভে আকরগ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমালোচনামূলক গ্রন্থ, পত্র পত্রিকা ও বৈদ্যুতিন মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র গবেষণাপত্রটি অভ্র, কালপুরুষ ১৪ ফন্টে মুদ্রিত হয়েছে। শিরোনামের ক্ষেত্রে ১৬ ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে ১২ ফন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থপঞ্জির তালিকা নির্মাণের ক্ষেত্রে এ পি এ স্টাইল অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়াও বানান এর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাদেমির বানান বিধি মেনেই কাজ করা হয়েছে। এইভাবেই এই কয়েকটি নিয়ম মেনেই আমার গবেষণার কাজটি সমাপ্ত হয়েছে।

সূচিপত্র

অধ্যায়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	১-৫
প্রথম অধ্যায়- লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি	৬-১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়- সাহিত্যকৃতির দুই ধারা	১৩-২০
তৃতীয় অধ্যায়- শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী	২০
চতুর্থ অধ্যায়- সমকালীন মেয়েদের লেখালিখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া	২০-২৮
উপসংহার	২৯-৩১
গ্রন্থপঞ্জি	৩২-৩৭

ভূমিকা

সাহিত্যের নানা ধারার মধ্যে কথা সাহিত্য হল অন্যতম। তার গঠন, বিষয় ইত্যাদি নিয়ে নানা রকম কাজকর্ম হয়েই চলেছে। মানব জীবনের দর্পণই হলো সাহিত্য। এই কথাসাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের টুকরো টুকরো ছবি ফুটে ওঠে বিভিন্ন গল্প উপন্যাসের বিষয়ের আনাচে-কানাচে।

বাংলা কথা সাহিত্যের একজন অনুরাগী পাঠক হিসাবে শৈলবালা ঘোষজায়ার লেখা কয়েকটি গল্প পড়তে গিয়ে আমার শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্যের প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। সেই সূত্রেই ওঁনার সাহিত্য সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে ইচ্ছে হয়। তারপর পি এইচ ডি-এর গবেষণা অভিসন্দর্ভটি লেখার সুযোগ পেয়ে আমি "শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত): একটি মূল্যায়ন"- এই বিষয়টি নির্বাচন করেছি। তাঁর রচনা পাঠ করে সহজেই বোঝা যায় তিনি নানান সময়ে যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাই তুলে ধরেছেন তাঁর বিভিন্ন লেখায়। তাঁর সৃষ্টি করা চরিত্ররা সবই তাঁর নিজের চেনা, জানা বাস্তবের পটভূমি থেকে তুলে আনা। তাঁর রচনাগুলি সময়োপযোগী ও তাৎপর্যপূর্ণ। কিছু কিছু লেখা সময়ের হিসাবে তাঁর সময়ের হলেও বর্তমানেও আমরা যেন সমাজের মধ্যে সেসব ছবি মাঝেমধ্যে উঠে আসতে দেখতে পাই।

শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার একটা বড় অংশ জুড়ে প্রতিকূলতার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা লাভের জন্য কি কি বাধার মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে সেই রকম ছবি, শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতার বোধ, সংসারে আবদ্ধ নারীর নিয়মমাফিক জীবন যাপন এবং পুণ্যের জয়, পাপের দন্ড ইত্যাদি বিষয় বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়।

এর পাশাপাশি জাতপাত প্রসঙ্গ ও জাতির ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন, ধর্মানুষ্ঠানের সাথে যুক্ত মানুষের দুর্মতি, স্বার্থপরতা, ভন্ডামী, ডাকাতি, সামাজিক কুসংস্কার, সাধারণ গৃহস্থ জীবনের ছবি, বিজ্ঞান নির্ভর মানসিকতা, নারী হরণ, সতীত্ব নষ্ট ও খুনের দৃশ্য এবং সমাজে পুলিশের শাসনের প্রসঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়। তার এই উপলব্ধি বর্তমান সময়েও তাৎপর্যবাহী। এখন আমরা তাঁর রচনাগুলি (নির্বাচিত) বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয়গুলিকে দেখতে পাব। আর এই জন্যই তাঁর লেখা রচনায় বিষয় ও সময়কে বুঝে নিতেই আমরা বেছে নিয়েছি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে।

আলোচ্য বিষয়টিকে যেভাবে অধ্যায় ভিত্তিক সাজিয়েছি তা হল- ভূমিকা, লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি, সাহিত্যকৃতির দুই ধারা, শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী, সমকালীন মেয়েদের লেখালিখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি।

এবার এই সমস্ত অধ্যায় গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব এই প্রসঙ্গে প্রথমেই ‘লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি’ নামের এই অধ্যায়ের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই অধ্যায়ের যে সমস্ত বিষয়গুলি দেখিয়েছি তা হল- রাজনৈতিক পরিসর, ওই সময়ের রাজনীতির বিভিন্ন দিক, রাজনৈতিক ভাবে কি কি ঘটছে দেখা এবং মেয়েরা এই ক্ষেত্রে কতটা সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে তা দেখা। এছাড়াও সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া নানান বিষয়গুলিও দেখে নেবার চেষ্টা করব। এখানে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব ও নিজের ধর্ম প্রতিষ্ঠার তাগিদ লক্ষ করা যায়, শিক্ষায় কার প্রাধান্য বেশি তা হিন্দু-মুসলমান ও নারী–পুরুষ নির্বিশেষে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই শিক্ষাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের এগিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা দেখে হিন্দুদের ঈর্ষা বোধের বিষয় ও এটাকে নিয়ে হিন্দুদের নিজেদের

দুর্বলতা প্রকাশের মতো বিষয়ও দেখা যায়। এছাড়াও ধর্ম নিয়ে বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষের স্বার্থ সিদ্ধি, কিছু মানুষের হয়রানির ছবি দেখা যায়। সঙ্গে লিগের প্ররোচনা দান যার ফলস্বরুপ দাঙ্গার ভহাবহ পরিস্থিতি, বহু মানুষের মৃত্যু বিছানো পথ এবং স্বজন ও আশ্রয় হারানোর যে ইতিহাস সেই দেশভাগ প্রভৃতির বর্ণনা।

বিশ শতকের শুরুতে মেয়েদের জীবনচর্যা কেমন, কর্মসংস্থান ও আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তারা বাইরে বের হচ্ছে কিনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। শিক্ষার উপলব্ধি ও বিকাশ, চেতনার জাগরণে নারীদের ভূমিকা, সমাজের মধ্যে থাকা সমাজবিধান ও যার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে আইনের গুরুত্ব কতটা তা দেখা, শাসনতন্ত্রে নারীর স্থান প্রভৃতি প্রসঙ্গ দেখা যায়।

কৃষি শিল্প সংস্কৃতির পরিচয় বর্তমান, ওই সময়কার অন্যান্য সাহিত্যের বিষয় ও ভাবনা কেমন তার পরিচয় এর প্রসঙ্গ দেখানো হয়েছে। এর সঙ্গেই লেখিকাকে জেনে নেওয়ার তাগিদে লেখিকার জীবনের নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। এই অধ্যায়ের সম্পূর্ণটা জুড়ে উপরে উল্লেখ করা বিষয়গুলি দেখা যাবে সম্পূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনার অংশে।

এরপর ‘সাহিত্যকৃতির দুই ধারা’ নামের এই অধ্যায়ের যে দুটি মূলভাব তা হল- (ক) শিক্ষামূলক রচনা (খ) সমাজকেন্দ্রিক রচনা।

এখন প্রথমে শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে কি কি বিষয় দেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই অংশে মেয়েদের লেখালেখির জগতে আসার প্রসঙ্গ, নারীবাদী ভাবনার বিষয় ও শিক্ষালাভের প্রসঙ্গ দেখানো হয়েছে। এখানে শিক্ষার প্রসঙ্গ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষালাভ

করতে মেয়েদের কত বাধা পার করতে হয় তার ছবি, শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতার বোধ, মেয়েদের লেখালেখি করলে এক ঘরে করে দেওয়া ও জাত যাওয়ার প্রসঙ্গও দেখা যায়। এছাড়াও নারীর প্রতিবাদ, যুক্তিপূর্ণ কথা বলা, স্বাবলম্বী হওয়া এ সমস্ত বিষয় দেখতে পাওয়া যায় এর পাশাপাশি নারী শিক্ষিত কর্মজীবী হলেও তার ক্ষেত্রেও নানারকম সমস্যায় পড়ার ঘটনা দেখা যায়। এ সমস্ত কিছু বিষয় হলো শিক্ষামূলক রচনার অংশ।

এরপর সমাজ কেন্দ্রিক রচনা এই অংশে সমাজের নানান বিষয় দেখা যায়। এখানে জাতপাত প্রসঙ্গ, জাতির ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন, ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মানুষের দুর্মতি, সমাজে ধর্মগুরু স্থানীয় মানুষের কথা মতো চলে বিপদে পড়ার ঘটনা, ডাকাতির প্রসঙ্গ, কুসংস্কার, সাধারণ জীবন যাপন, পাহাড়ি মানুষের জীবনধারা, বিজ্ঞান নির্ভর মানসিকতা, নারী - হরণ, সতীত্ব নষ্ট ও খুনের দৃশ্য, টাকা দিয়ে জমিদার শ্রেণির মানুষের কুকর্ম চাপা পড়ে যাবার ঘটনা, ইমানদারীর প্রসঙ্গ, পাপের দ্বন্দ্ব ও পুণ্যের জয় এবং সমাজের পুলিশের শাসনের প্রসঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয়গুলি রচনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে মূল অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে দেখা যাবে।

পরবর্তী 'শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী'- অধ্যায়ে ভাষা, মেয়েলি শব্দের ব্যবহার, কথক, কথন, মুখের ভাষা চরিত্র অনুযায়ী কতটা যথাযথ, শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার, প্রশ্ন-উত্তর ধরনের গদ্য আছে কিনা দেখা, ছড়ার ব্যবহার, প্রবাদের ব্যবহার, সমান্তরাল প্যাটার্নের গদ্যের ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়গুলিকে মূল পাঠ থেকে দেখানোর চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ের বিস্তারিত অংশে।

পরবর্তী 'সমকালীন মেয়েদের লেখালিখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া' নামের অধ্যায়ে প্রথমেই নারী প্রগতির ইতিহাসে স্মরণীয় কয়েকজন নারীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে,

যাদের হাত ধরে মেয়েরা লেখার জগতে প্রেরণা পেয়েছিল ও আত্মপ্রকাশ করার পথ পেয়েছিল। এছাড়াও শৈলবালা ঘোষজায়ার সমকালীন কয়েকজন লেখিকাদের পরিচয় ও তাঁদের লেখালেখির বিশ্লেষণে, তাঁদের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ভাবনাগত তফাৎটা কোথায় সেই দিকটা দেখানোর চেষ্টা করেছি। এ প্রসঙ্গে লেখিকার সমকালীন কয়েকজন লেখিকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বেগম রোকেয়া, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, আশালতা সিংহ তাঁদেরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও গিরিবালা দেবী, ইন্দিরা দেবী, স্বর্ণকুমারী দেবী উল্লেখযোগ্য। তবে এতজন নামের উল্লেখ করলেও আলোচনার জন্য এখানে কয়েকজনকে বেছে নিয়েছি। এভাবেই এই অধ্যায়ে ভাবনাগত দিক থেকে কে কোন দিককে প্রাধান্য দিচ্ছে এবং মতামতে তফাত কেমন সেই বিষয়টি দেখানোর চেষ্টা করেছি এই অধ্যায়ের বিস্তারিত অংশে। এছাড়াও সব শেষে থাকছে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি অংশ।

শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত): একটি মূল্যায়ন

বিশ শতকের প্রথমার্ধে প্রসিদ্ধ অন্যান্য লেখিকাদের মতো শৈলবালা ঘোষজায়ার নামও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে জুড়ে আছে, তবে সেই ভাবে প্রচার পাননি তিনি। শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্ম ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামের কক্সবাজারে। তাঁর পিতা কুঞ্জবিহারী নন্দী ছিলেন সেনাবাহিনীর অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জন। মা হেমাঙ্গিনী দেবী, তিনি সম্পর্কে শ্রী অরবিন্দ ঘোষের খুড়তুতো বোন ছিলেন, অর্থাৎ ঋষি অরবিন্দ হলেন শৈলবালার মামা। দাদা অশ্বিনী কুমার নন্দী ছিলেন সেনা বিভাগের একজন ডাক্তার। চাকরী থেকে অবসর নিয়ে তাঁর পিতা বর্ধমানে বসবাস করতে শুরু করেন। সংস্কার, সামাজিক প্রথা, রক্ষণশীলতা না থাকায় পরিবার ছিল পড়াশোনার অনুকূল কোনোরকম বাধা পরিবার থেকে আসেনি, এখানে খোলামেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিলেন লেখিকা। তিনি বর্ধমান রাজ বালিকা বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছিলেন। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বর্ধমান জেলার মেমারি গ্রামে এক বিশাল একান্নবর্তী পরিবারে, নরেন্দ্রমোহন ঘোষের সঙ্গে বিয়ে হয়ে যায় ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে (১৩১৪ বঙ্গাব্দে) এবং সেই সময় স্বামী নরেন্দ্রমোহন ঘোষ ইউনান সাহেবের হোমিও কলেজে হোমিওপ্যাথি বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। এই বিয়ের পর লেখিকার সাহিত্য সাধনায় নানান বাধা আসে। বিদ্যালয়ের পাঠ এইখানেই শেষ করতে হলেও পিতার অনুকূল্যে আগে থেকেই তাঁর সাহিত্যরুচি গড়ে উঠেছিল। অবসরপ্রাপ্ত পিতাকে বঙ্কীমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বই পড়ে শোনাতে হত, পিতা মারা যাবার পর বড় ভাইও পড়াশোনায় সাহায্য করেছিলেন তাঁকে। শৈলবালার শৈশব ও বাল্য বয়সের শিক্ষালাভ ঘটেছে বর্ধমান রাজ বালিকা বিদ্যালয় থেকে। তাঁর লেখা ‘পাঠশালার স্মৃতি’ নামক লেখা থেকে তাঁর স্কুল, শিক্ষালাভ, ছাত্রীজীবনে সততার ছবি দেখা যায় স্কুলের শিক্ষিকার শৈলবালার উপর ভরসা রাখা থেকে। এখানে লেখিকার বিদ্যালয়ের

প্রতি আবেগের প্রকাশ দেখা যায়। এখান থেকে তাঁর পড়াশোনার প্রতি একাগ্রতার কথা ও সত্যিকথা বলার দৃশ্য থেকে তাঁর সৎ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও তিনি তাঁর বাবার উপদেশের কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন সত্য স্বীকার করার কথা, মিথ্যা বলে প্রান না বাঁচানোর কথা যা তাঁর সততার রুচিকেই প্রকাশ করে।

তবে এটা গেল সুন্দর শৈশবের পঠনপাঠনের স্মৃতি। এই সমস্ত কিছুতে বিবাহ পরবর্তী জীবনে কিছুটা ছেদ আসে। জানা যায় বিয়ের পর সংসারের সমস্ত কাজ করে রাতে লুকিয়ে লণ্ঠনের আলোয় লেখালিখি করতেন, তাঁর স্বামী, দু-একজন দেওর ও ভাসুরপো তাঁর পড়াশোনা ও লেখালিখিতে তাঁকে সাহায্য করতেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সেখ আন্দু'-র পাণ্ডুলিপি তাঁর স্বামী 'প্রবাসী'র দপ্তরে পৌঁছে দিতেন। এই প্রবাসী পত্রিকার হাত ধরেই শৈলবালা ঘোষজায়ার সাহিত্যের পথে যে যাত্রা তা যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল পাঠক সমাজে। এছাড়া তার 'বীণার সমাধি' বেগমবাহার গল্প প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরষ্কার পায়। কবিকঙ্কন চণ্ডীর বিষয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে সরস্বতী উপাধি পান এবং নদিয়ার মানদমণ্ডলী তাঁকে পরে 'সাহিত্য ভারতী' ও 'রত্নপ্রভা' উপাধি প্রদান করেন। এছাড়াও শৈলবালা সম্পর্কে একটু জানা যেতে পারে ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর রবীন্দ্রসদনে দেওয়া ছয়জন লেখিকার সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান থেকে। সেদিন ইউনিভার্সিটি উইমেন্স এসোসিয়েশন এর উদ্যোগে অনুষ্ঠানে ছয়জন লেখিকার আলোক চিত্র সহযোগে একটি বই প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানে লেখিকাদের পরিচিতি দিয়েছিলেন মহাশ্বেতা দেবী। তিনি সেখানে শৈলবালা ঘোষজায়া সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তা সবটা শৈলবালা ঘোষজায়ার চিঠিতে জানানো বিষয়েরই অংশ। লেখিকার সম্পর্কে বলতে গেলে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এইভাবেই নানান সম্মান ও মর্যাদা প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে তিনি সাহিত্যের পথে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

এরপর যদি তাঁর বিবাহিত জীবনের দিকে চোখ রাখি সেখানে দেখা যাবে স্বামী মাত্র কয়েক বছর ডাক্তারি পড়ার পরই তাঁর বিবাহিত জীবনে অন্ধকার নেমে আসে, ১৩২৬ বঙ্গাব্দে স্বামী নরেন্দ্রমোহনের উন্মাদ হয়ে যাওয়ার ঘটনায়। এই উন্মাদ অবস্থায় দীর্ঘ ১০ বছর ভোগেন তা তরুণী শৈলবালার জীবনের এক শোচনীয় অধ্যায়। এরপর ১৩৩৬ সালে তাঁর স্বামী মারা যান। এইভাবে ১৩ বছরে বিয়ে, কয়েকবছরের দাম্পত্য জীবন, ১০ বছর অসুস্থ স্বামী নিয়ে সংসার করা, চিকিৎসা করা এবং বৈধব্য জীবনে প্রবেশ ইত্যাদির দ্রুত সংযোজন শৈলবালা ঘোষজায়ার জীবনে নতুন মোড় নিয়ে আসে। নিঃসন্তান শৈলবালার জীবন পরিবারের নানান চাপ ও আঘাতে বিপর্যস্ত হতে থাকে। পরিজনদের পাশে না পাওয়া, নিরাপত্তাহীনতা, আর্থিক অনিশ্চয়তার মতো পরিস্থিতিতে ডুবে যাওয়া জীবনে লেখালিখি হল একমাত্র সম্বল। এভাবেই সাহিত্যে রেখে গেছেন অসংখ্য গল্প ও উপন্যাসের সম্ভার। এই সমস্ত রচনা থেকেও তাঁর বাস্তব জীবনের ছাপ লক্ষ্য করা যায়, যেমন 'তেজস্বতী' উপন্যাসে শিক্ষিতা তৃপ্তির জ্যোতিষ বিদ্যার উপর ভরসা যা শৈলবালার ভাবনারই প্রতিফলন, এই জন্যই তাঁর পরিবারের কোন এক সদস্যের ঠিকুঞ্জি তৈরী করার কথা জানা যায় অরুণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত ও সম্পাদিত 'সেরা পাঁচটি উপন্যাস শৈলবালা ঘোষজায়া' নামক বইয়ের ভূমিকা অংশে ভারতী ঘোষের দেওয়া তথ্য থেকে।

তিনি ১৯৫৩-৫৪ সাল নাগাদ শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে পুরুলিয়ার রামচন্দ্রপুরে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতীর কাছে আশ্রয় নেন। এভাবেই জীবনের শেষ দিকের বেশ কিছুটা সময় এখানে কাটিয়েছিলেন। তবে ভারতী ঘোষের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় আমৃত্যু আসানসোলে ভাসুরের বাড়িতেই ছিলেন তিনি। এছাড়াও জানা যায় বৈধব্য জীবনে নানান ছুঁৎমার্গ মেনে চলতেন তিনি। তাই নিজে রান্না করে খেতেন, চপ

কাটলেট সকল খাওয়াকে মদ মাংস খাওয়া ভাবতেন এবং ক্যাডবেরিতে খুব আপত্তি ছিল, সেই জন্য 'বিদেশী পাটালি' বলে ক্যাডবেরি দেওয়া হত তাঁকে। এইভাবেই তাঁর ব্যক্তিজীবনের কিছু বিবরণ আমরা দেখতে পেলাম তাঁর রচনা ও উপরিউক্ত দেওয়া তথ্য থেকে। শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনা সংখ্যা ৫০ এর মতো তা স্বত্বেও তিনি বাংলা সাহিত্যে একটা অনালোচিত দিক হয়েই রয়ে গেছেন, যা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। 'সেখ আন্দু', 'নমিতা', 'মিষ্টি সরবত', 'মহিমাদেবী', 'সই', 'জন্মপরাধী', 'জন্মঅভিশপ্তা', 'মঙ্গল মঠ', 'ইম্‌নদার', 'অবাক', 'রঙিন ফানুস', 'বিভ্রাট', 'অরু', 'গঙ্গাপুত্র', 'ঘৃণাহতা', 'তেজস্বতী', 'বিনীতাদি' ইত্যাদি উপন্যাস ও কিছু গল্পসঙ্কলন, নাটক, শিশুদের সাহিত্য এই সমস্ত কিছু মিলে বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধি দান করেছেন। এই দীর্ঘ যাত্রাপথ পার করে ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর জীবন অবসান ঘটে।

শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্ম ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। তাঁর বেড়ে ওঠা ও লেখালিখি যে সময়ে, তখনকার রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি কেমন ছিল তা আলোচনার মাধ্যমে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। ওই সময়ের সমাজ কোন ইঙ্গিত লেখিকার মনে জাগিয়েছে, কোন পরিস্থিতির চিহ্ন হৃদয়ে রেখাপাত করেছে তা নিয়েই সাহিত্য সম্ভারকে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করব। কারণ সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা চেতনার বদলের ছাপ পড়ে সমাজ ও সাহিত্যে। তাই ওই সময় পর্বের সঙ্গে পরিচিতি স্থাপন দরকার কারণ সাহিত্যই সমাজের দলিল। এখন তাঁর রচনাগুলি (নির্বাচিত) বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিষয় ও সময়কে বুঝে নিতেই বেছে নিয়েছি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটিকে।

আলোচ্য বিষয়টিকে যেভাবে অধ্যায় ভিত্তিক সাজিয়েছি তা হল- ভূমিকা, লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি, সাহিত্যকৃতির দুই ধারা, শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার

গদ্যশৈলী, সমকালীন মেয়েদের লেখালিখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি।

এবার এই সমস্ত অধ্যায় গুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব এই প্রসঙ্গে প্রথমেই 'লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি' নামের এই অধ্যায়ের বিষয় সংক্ষেপে আলোচনা করব।

বিশ শতকের শুরুর দশকে শৈলবালা ঘোষজায়ার বেড়ে ওঠা ও লেখালিখির শুরুয়াত। এই সময় ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজে যে পরিবর্তন তা থেকে সাহিত্য আলাদা নয়, এই সমস্ত কিছুর প্রভাব সাহিত্যেও পড়েছে। এই সময়ের রাজনীতির যে ধারা সেখানে আছে বহু ঘটনা। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতি, নানান সভা ও চুক্তির পরিস্থিতি আর এর সঙ্গে জুড়ে থাকে স্বাধীনতা লাভের প্রসঙ্গ যা জাতির ইতিহাসে একটা বিরাট আধ্যায়ের সূচনা করে। ইতিহাসের এই সমস্ত ঘটনা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব ইতিহাসের ঘটনা বিশ্লেষণের মাধ্যমে।

বাংলা সাহিত্য সূচনা লগ্ন থেকেই যুগ ও কালের সঙ্গে একই সূত্রে গাঁথা। যুগ ও কাল এর উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে পরিবর্তনের ধারা। তাই শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্ম থেকে সাহিত্য সাধনা যে সময়কালের উপর গড়ে উঠেছে তাতে সমাজের কোন কোন বিষয় লেখিকার হৃদয়কে স্পর্শ করেছে তা আমরা দেখতে পাব তার জন্যই এখন আলোচনা করে দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব ওই সময়কাল এর রাজনৈতিক পরিমণ্ডল, সামাজিক প্রেক্ষাপট, সামাজ বিধান ও আইন ইত্যাদি বিষয়।

উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের শুরু এই সন্ধিক্ষণে জন্ম শৈলবালা ঘোষজায়ার। এক স্বাধীনতা আন্দোলনের অধ্যায়ে তাঁর জন্ম। এই জন্ম লগ্নেই বঙ্গে নারীর উত্থান ও শিক্ষা আন্দোলনের নানান বিষয়ের শুরু যার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত মার্গারেট

এলিজাবেথ নোবেল্ (ভগিনী নিবেদিতা)। তিনি স্বদেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে 'রাস্কিন স্কুল' স্থাপন করেন। তিনি যখনই প্রচলিত ধর্ম ও গতানুগতিক অধ্যাপনা সম্পর্কে সংশয়ে ছিলেন তখন ইংল্যান্ডগামী স্বামী বিবেকানন্দের বাণী শুনে তিনি মুগ্ধ হন এবং স্বামীজীর মৃত্যুর পর ভারতের মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহন করেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল অখণ্ড ভারতবর্ষ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আধ্যায়ে তিনি এক স্মরনীয় নাম। এর পাশাপাশি বাংলার নারী মুক্তির জন্য শিক্ষার উপযোগিতা বুঝিয়ে তিনি ছাত্রী আনতেন। নারী মুক্তির জন্য তাঁর দেখানো পথ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দেখানো পথেই বাংলার নারীরা এসেছে সাহস ও আত্মত্যাগের প্রেরনা নিয়ে। অনেকে সামনে না এসেও আড়াল থেকে বিপ্লবীদের সাহায্য করে গেছেন। জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতের সঙ্গে ওতপ্রোত জড়িয়ে থেকে বাংলার নারী তাদের গৌরবজনক ভূমিকা পালন করছেন। সরোজিনী নাইডু, নেলী সেনগুপ্তা, অরুনা আসাফ আলী, সুচেতা কৃপালনির মতো নেত্রী ধরনের নারীর নাম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে মর্যাদার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। এর পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য নাম সরলাদেবী চৌধুরানী ইনিই সেই তেজস্বী নারী যিনি প্রথম 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গেয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। নারীশক্তিকে যথাযথভাবে দেশের মুক্তি আন্দোলনের উপযোগী করে তোলার জন্য তিনি বিশেষ কিছু কাজ করতে ব্রতী হয়েছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকেই। বাংলার নারীদের সাহায্য ছাড়া গণ-আন্দোলন ও বিপ্লবীদের আন্দোলন এত ব্যাপক হতে পারত না। সমস্ত শ্রেণীর নারীই সেদিন সাম্রাজ্যবাদী শোষকদের বিরুদ্ধে তাঁদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, কোনোরকম ত্যাগ স্বীকার এর ভয়ে তাঁরা সেদিন তাদের পিছনে হঠে যায়নি। এই হল উনিশ শতকের শেষ দশকের অধ্যায়ের অল্প বিস্তর বর্ণনা।

এর পরে বিশ শতকের প্রথমার্ধ বিশ্ব ইতিহাস তথা ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। অসংখ্য রাজনৈতিক ঘটনার স্বাক্ষ্য ধারন করে আসছে এই অধ্যায়। এই শতকে ঘটা স্বাধীনতা আন্দোলন ও ঔপনিবেশিক শক্তির স্বার্থ সিদ্ধি করার যে চেষ্টা তার থেকেই এই সময়ে নানান আন্দোলন, বিপ্লবী কার্যকলাপ ও নানান চুক্তির আবির্ভাব, এই সমস্ত কিছুর সমন্বয়ে এই অধ্যায় বৃহত্তর আকার ধারন করে যার প্রভাব সুদূর প্রসারী ও প্রতিক্রিয়াশীল। ইতিহাসের পটে আজও যে সমস্ত ঘটনার কথা লিখিত আছে সেগুলি দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব।

বিশশতকের প্রথমার্ধ বিপ্লববাদের কাল হিসাবে পরিচিত। তাই বিভিন্ন সমিতি ও বিপ্লবীদের পরিচয় ও তাদের কার্যকলাপের বর্ণনা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো পরিস্থিতি, বিভিন্ন আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, এছাড়াও ধর্ম নিয়ে বিদ্বেষকে কেন্দ্র করে কিছু মানুষের স্বার্থ সিদ্ধি, কিছু মানুষের হয়রানীর ছবি, সঙ্গে লিগের প্ররোচনা দান যার ফলস্বরুপ দাঙ্গার ভহাবহ পরিস্থিতি, বহু মানুষের মৃত্যু বিছানো পথ ও স্বজন- আশ্রয় হারানোর যে ইতিহাস সেই দেশভাগ প্রভৃতির বর্ণনা ও নানান ঘটনার প্রেক্ষিতে ঐ সময়কার পরিস্থিতি কেমন তা বর্ণনা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। এছাড়াও সমাজের মধ্যে ঘটে যাওয়া নানান বিষয়গুলিও দেখে নেবার চেষ্টা করব। সেই সূত্রে হিন্দু মুসলিম দ্বন্দ্ব ও স্বধর্ম প্রতিষ্ঠার তাগিদ লক্ষ করা যায়, শিক্ষায় কার প্রাধান্য বেশি তা হিন্দু- মুসলমান ও নারী–পুরুষ নির্বিশেষে দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই শিক্ষাকে কেন্দ্র করে মুসলিমদের এগিয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা দেখে হিন্দুদের ঈর্ষা বোধের বিষয় ও এটাকে নিয়ে হিন্দুদের নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করার বিষয় দেখানো হয়েছে।

বিশ শতকের শুরুতে মেয়েদের জীবনচর্যা কেমন, কর্মসংস্থান ও আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে তারা বাইরে বের হচ্ছে কিনা ইত্যাদি প্রসঙ্গ। শিক্ষার উপলব্ধি ও বিকাশ, চেতনার জাগরণে নারীদের ভূমিকা, সমাজের মধ্যে থাকা সমাজবিধান ও যার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে আইনের গুরুত্ব কতটা তা দেখা, শাসনতন্ত্রে নারীর স্থান প্রভৃতি প্রসঙ্গ দেখানোর চেষ্টা করেছি।

কৃষি শিল্প সংস্কৃতির পরিচয় বর্তমান, ওই সময়কার অন্যান্য সাহিত্যের বিষয় ও ভাবনা কেমন তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি। এর সঙ্গেই লেখিকাকে জেনে নেওয়ার তাগিদে লেখিকার জীবনের নানান বিষয় নিয়ে আলোচনা আছে। উপরে উল্লেখ করা বিষয়গুলি দেখা যাবে সম্পূর্ণ অধ্যায়ের আলোচনার অংশে।

পরবর্তী ‘সাহিত্যকৃতির দুই ধারা’ নামের এই অধ্যায়ে তাঁর রচনার বিষয় বস্তু অনুযায়ী যে দুটি মূলভাব তা হল- (ক) শিক্ষামূলক রচনা (খ) সমাজকেন্দ্রিক রচনা।

এখন প্রথমে শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে কি কি বিষয় দেখানো হয়েছে তা সংক্ষেপে আলোচনা করব। এই অংশে মেয়েদের লেখালেখির জগতে আসার প্রসঙ্গ, নারীবাদী ভাবনার বিষয় ও শিক্ষালাভের প্রসঙ্গ দেখানো হয়েছে। শিক্ষালাভ করতে মেয়েদের কত বাধা পার করতে হয় তার ছবি, শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতার বোধ, মেয়েদের লেখালেখি করলে এক ঘরে করে দেওয়া ও জাত যাওয়ার প্রসঙ্গও দেখা যায়। এছাড়াও নারীর প্রতিবাদ, যুক্তিপূর্ণ কথা বলা, স্বাবলম্বী হওয়া এ সমস্ত বিষয় দেখতে পাওয়া যায় এর পাশাপাশি নারী শিক্ষিত কর্মজীবী হলেও তার ক্ষেত্রেও নানারকম সমস্যায় পড়ার ঘটনা দেখা যায়। এ সমস্ত কিছু বিষয় হল শিক্ষামূলক রচনার অংশ।

এগুলি একটু বুঝে নেবার তাগিদে প্রথমেই ‘বিজয়ার নমস্কার’ গল্পটি আলোচনা করে দেখে নেব। গল্পটির শুরুতেই দেখতে পাব ব্যথা নামক চরিত্রের গৃহস্থালী সামলানোর চিত্র এবং বাড়ির চাকরদেরও হুকুম শোনার চিত্র। আসলে ব্যথা অন্নদাসত্বের পায়ে মাথা বিকিয়েছে। ব্যথার জীবন যেহেতু অনুগ্রহের দানে চলে তাই লাথি ঝাঁটা খেয়ে চুপ করে থাকাই তার জন্য নিরাপদ।

তবে হঠাৎ এক প্রৌঢ়াভদ্রমহিলা দ্বারে এসে ব্যথা দেবীর কথা জানতে চায়, সেসময় ব্যথাই তাকে নমস্কার জানিয়ে নিজের ঘরে বসায় এবং পরিচয় দেয়। তারপর ব্যস্ততা দেখে লেখার বিষয়ে জানতে চায়। সে কাজের ফাঁকে লেখে একথা জানায়। তারপর প্রৌঢ়া মহিলা আরও লেখা চেয়ে, পাঁচ টাকা দিয়ে চলে যান। এখানেও মেমের হাতে টাকা নেওয়ায় তার জাত গেছে বলে তাকে গঞ্জনা সইতে হয় এবং তাকে একঘরে করে দেওয়া হয়।

এমনকি তার বিবাহিত জীবনের বর্ণনাতেও ভয়াবহ ছবি দেখা যায়। ব্যথার মা এক বড় গৃহস্থ ঘরে কন্যা সম্প্রদান করে মারা যান। সংসারে দুই ভাই সকলেই মেজাজী, অসৎ ও নেশা করতে পটু। একদিন বস্ত্রের ব্যবসায় আগুন লাগলে জুয়াচুরির অপবাদে নালিশ হয়। এ নিয়ে তিনভাই আলোচনায় বসলে বচসা বাঁধে ও কাটাকাটি শুরু হয়। সেই দিনেই ভয়ানক ক্যাঁচার বিষে ব্যথার স্বামীরও মৃত্যু হয়। পরে ভাসুর সব আত্মসাতের জন্য তাড়াবার পরিকল্পনা করে, এমনকি তার পাঁচ মাসের শিশুর ভুল চিকিৎসা করিয়ে প্রাণ সংহারও করে।

এমনসময় দূর সম্পর্কীয় পিসতুতো ভাই ওই গ্রামে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে এসব জানতে পেরে তাকে নিয়ে এলে ব্যথার ভাসুর তাকে দুশ্চরিত্রা বলে রটিয়ে তার সম্পত্তি ভোগ করে। এই ভাইয়ের থেকে তার শিক্ষা লাভ। পরে ভাইয়ের বিদেশে যাত্রাকে কেন্দ্র করে ভাইয়ের পিসিমার বাড়িতে আশ্রয়লাভের ঘটনা শুরু। ওদিকে 'আনন্দ পত্রিকার' অফিস থেকে ওই

মেম ব্যথাকে লেখা চিঠির উত্তর না পেয়ে গিয়ে হাজির হন বাড়িতে এবং দুর্দশাগ্রস্ত ব্যথাকে নিয়ে যান নিজের সঙ্গে। তারপর বিজয়াতে আশীর্বাদ এবং ব্যথার নমস্কার প্রদানে গল্প শেষ। এইভাবে লেখালিখি করতে গিয়ে নানান সমস্যা ও ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের চিত্র গল্পে দেখা যায়।

এই শিক্ষালাভের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে আরও যে সমস্ত রচনায় সেগুলি হল- 'মনীষা', 'দীপ্তি', 'শিশুর স্মৃতি', 'অরু', 'জন্ম-অভিশপ্তা', 'অবাক', 'তেজস্বতী', প্রভৃতি। এখানে কোনো চরিত্রকে শিক্ষিত হয়ে অন্যায় এর বিরুদ্ধে যেমন লড়তে ও প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে তেমনি কাউকে আবার শিক্ষিত ও চাকুরিরতা হয়েও স্বামীর হাতে অত্যাচারিত হতেও দেখা যায়। পাশাপাশি রচনায় শিক্ষিত বিধবা নারীকে কঠোর নিয়ম পালন না করিয়ে তাকে শিক্ষার মাধ্যমে সাবলম্বনের পথ দেখিয়েছেন। এছাড়াও নারীকে শিক্ষার দ্বারা মাতৃত্ব, স্বাস্থ্য, যুক্তি ইত্যাদি নানান দিকে সচেতন করে গড়ে তুলেছেন লেখিকা তাঁর রচনায়। এইরকম নানান বিষয় ভাবনায় সমৃদ্ধ তাঁর শিক্ষামূলক রচনাগুলি।

এরপর সমাজ কেন্দ্রিক রচনা এই অংশে সমাজের নানান বিষয় দেখা যায়। এখানে জাতপাত প্রসঙ্গ, জাতির ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন, ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত মানুষের দুর্মতি, সমাজে ধর্মগুরু স্থানীয় মানুষের কথা মতো চলে বিপদে পড়ার ঘটনা, ডাকাতির প্রসঙ্গ, কুসংস্কার, সাধারণ জীবন যাপন, পাহাড়ি মানুষের জীবনধারা, বিজ্ঞান নির্ভর মানসিকতা, নারী-হরণ, সতীত্ব নষ্ট ও খুনের দৃশ্য, টাকা দিয়ে জমিদার শ্রেণির মানুষের কুকর্ম চাপা পড়ে যাবার ঘটনা, ইমানদারীর প্রসঙ্গ, পাপের দণ্ড ও পুণ্যের জয় এবং সমাজে পুলিশের শাসনের প্রসঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়। এই সমস্ত বিষয়গুলি রচনার বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখা যাবে।

সমাজের এই সমস্ত বিষয় গুলি বুঝে নিতে প্রথমেই "ভূমিকম্প" গল্পের কথায় আসা যাক। মনীব ও ভৃত্যের ভূমিকম্পের সম্মুখীন হওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে। এই গল্পে মনীবের একাকী জীবনযাপন প্রণালী দেখা যায়, তবে যাই হোক ভূমিকম্পে সারা গ্রাম যখন ধ্বংস হয়ে গেছিল তখন কেবল তারা দুজন বাইরে থাকার জন্য বেঁচে যায়। এখানে ভুমিকম্পে কোন স্থান নিরাপদ তার ইঙ্গিত পাই।

'ভূমিকম্প' গল্পটি আলোচনায় দেখতে পাবো সেখানে এক পেনশন প্রাপ্ত বৃদ্ধ এবং তার চাকর লছমনের প্রসঙ্গ, এছাড়াও প্রভু-ভৃত্যের জীবনযাপনের প্রসঙ্গ। প্রভু সাধনা করে তাই মাঝেমধ্যে উপবাস করে ফলমূল, দুধ খেয়ে দিন কাটায় অমাবস্যা পূর্ণিমা উপলক্ষে, আর ভৃত্য যেদিন না আসে অত্যন্ত জরুরি কারণে সেদিন খায় ওসব খাবার। এভাবে দিন চলে যায় মন্দিরে একা একা। একদিন হঠাৎ লছ মন বাজারে গিয়ে জানতে পারে সেদিন নাকি সপ্ত গ্রহ যোগ অর্থাৎ মহাভারতের যুদ্ধের দিনে এই যোগ ছিল, তাই নাকি যুদ্ধ হয়েছিল। সে কথা স্মরণ করে আজকে ভয়ংকর কিছু ঘটার আভাস পাচ্ছে জ্যোতিষীরা। এই সমস্ত খবর জানতে পেরে এসে প্রভুকে জানায় এবং এই সপ্ত গ্রহযোগ নিয়ে নানান প্রশ্ন করতে থাকে।

পেনশন প্রাপ্ত কেরানি পুত্র হরনাথ এসিস্ট্যান্ট স্টেশন মাস্টার, বাবার আপদে বিপদে আসে যায় বৌমাও শ্বশুর কে নিজেদের কাছে রাখতে চায় কিন্তু শশুর ওখানে থাকতে চায় না। তার একা থাকার অভ্যাস তাই বিপদ না হলে একাই থাকে প্রভু। এভাবেই প্রভু এবং ভৃত্যের দিন চলে যায় । তবে সেদিন বাজারে জ্যোতিষীদের বাণী শোনার পর প্রভু গঙ্গাস্নান করতে যায়, সঙ্গে লছমন যেতে চায়, কিন্তু মা চিন্তা করবে তাই মাকে ছুটে গিয়ে একটু খবরটা জানিয়ে আসার কথা প্রভু বলে, এটা শুনে লছমন ছুটে গিয়ে খবরটা মাকে জানিয়ে

চলে আসে। তারপর প্রভুর সঙ্গে স্নানে বেরিয়ে পড়ে। যখন বেলা দুটো বাজে তারা কষ্ট হারিনীর ঘাটে স্নানে যায়। হঠাৎ দুজনেই কম্পন অনুভব করলে ভাবল হয়তো অনিয়মের কারণে তার মাথাব্যথা তাড়াতাড়ি শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রভু দেখে ভৃত্যও তাকে জড়িয়ে ধরেছে তখনই কম্পনের অনুভূতিটা দুজনেই প্রকাশ করে। দুজনই একে অপরকে ধরে থাকে এবং একটা পাথরকেও ধরে থাকে। হঠাৎ লছমন এই কম্পনের দাপটে অজ্ঞান হয়ে যায় পরে প্রভুও জ্ঞান হারায়। যখন জ্ঞান ফেরে ধীরে ধীরে মনে পড়ে সব। একজন দুধের সঙ্গে ব্র্যান্ডি মিশিয়ে তাদেরকে খাওয়ানোর পর জ্ঞান ফেরে। তারপর তারা একটা সেবা ভবনে আছে বলে জানতে পারে। সেবা দানকারী লোক এক সন্ন্যাসী সে চন্ডী পাঠ করে ধীরে ধীরে খবর পায় পুরো মুঙ্গের অঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত, জামালপুর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে, রেললাইন টেলিগ্রাফ সব খারাপ, বাইরের খবর পাওয়া যাচ্ছে না। এই সমস্ত কিছুর মাঝে জানা যায় লছমনের ভাই, বৌদি, মা সবাই মৃত। ওইদিন বাড়িতে থাকা সমস্ত লোকজন শেষ হয়ে গেছে, কেবল যারা বাইরে ছিল তারা বেঁচেছে। ধীরে ধীরে বাইরের খবর ভয়াবহ ভাবে শুনতে পাওয়া গেল। সে যেন অনুভব করেছিল কম্পন কালে মায়ের কোলে দোল খাওয়ার অনুভূতি।

এরপরে ছেলে আসে নিতে এবারে আর বাবার কথা শোনে না, স্টেশনের পাশে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেবার কথা জানিয়ে তাদেরকে নিয়ে যায়। সে এখন হুগলি না মগরার স্টেশন মাস্টার। ১৪ দিন কেটে গেছে, তখনও ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে শব দেহ উদ্ধার হয়নি। এর মধ্যে খবর আসে ফেকুপাঁড়ের। গ্রামে জীবিত কালে ফেকুপাঁড়ে চানাচুর বিক্রি কালীন যে ডাক দিত, ইসমাইল সেটাকে বিকৃত বিদ্রুপ করত। এই নিয়ে বচসা হতে হতে

তাদের বিবাদ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পর্যায়ে পৌঁছায়। ভূমিকম্পে যেন সেই সমস্ত বিদ্বেষ একেবারে শেষ হয়ে গেল। একে অন্যের ঘাড়ে মাথা রেখে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

নিজের বাড়িতে ধ্বংসের থেকে একটা ভাঙ্গা বাক্স বের করে তার থেকে 300 টাকা বের করে। হঠাৎ তারিণী মুখুজ্যে উপস্থিত হয় সে এসে বলে দিনু কাকা এতদিন কোথায় ছিলে সবাই। স্বদেশী লিমিটেড কোম্পানি ওয়ালা চন্দ্র চ্যাটার্জির খবর দিল দীনু কাকাকে। সম্পদ উদ্ধার করতে গিয়ে ধ্বস হয়ে মাথার খুলি চুরমার হয়ে তার মৃত্যু ঘটেছে বলে জানতে পারল। চন্দ্র চ্যাটার্জির কুকীর্তি আছে স্বদেশী কোম্পানিতে। এখানে অনেক আগে দীনু তার আয়ের টাকা দিয়েছিল কথা ছিল লাভ হলে পরে পাওয়া যাবে কিছু অর্থ। তাকে দেখে কিছু সৎ ব্যক্তি এমনকি বিধবারাও সেদিন দেশোদ্ধাদের জন্য সাধ্যমতো টাকা উৎসর্গ করে। তাদের টাকা সেদিন এই চন্দ্র চাটুজ্যে সব আত্মসাৎ করে নেয়, আর বলে সে কিছু জানে না কোম্পানি জানে। তারপর টাকা উদ্ধারের জন্য ধরাধরি করলে সে এড়িয়ে গিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে নেয়। সে তখন কাউন্সিলর মেম্বার, আত্মসাৎ করা টাকায় তখন বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি চারিদিকে। বাড়ি ভাড়া খাটায় এরকম রমরমা তার। ভূমিকম্পের পর তার বর্তমান পরিণতি এটা। তারিণীও এখন সে ধাক্কা সামলাচ্ছে। বিধবাদের কিছু সাহায্য করা হয়েছিল তখন যারা অসহায় ছিল তাদের বিপদেও পাশে ছিল কারণ দীনুর জন্যই তারা টাকা দিয়ে ফেঁসেছিল। একেবারে যাবার সময় ৩০০ টাকা তারিণীর হাতে দেয়, সে নিতে সংকোচ করলে দীনু তাকে দেখার জন্য তার নিজের ছেলে আছে বলে জানায় এবং তারিণীকে ভাঙ্গা হাতটা দেখিয়ে নিতে বলে।

এইভাবে ১৩৪০ সালে ঘটা ভূমিকম্প কে কেন্দ্র করে মানুষের পাপ কাজের পরিণতি দেখা গেল। এখানে স্বদেশী কোম্পানীর টাকা আত্মসাৎ করার ঘটনা উঠে এলো চন্দ্র চ্যাটার্জি

চরিত্র কে কেন্দ্র করে। এইভাবে ভূমিকম্পে চন্দ্রনাথ চাটুজ্যের মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে অসৎ উপায়ে অর্জিত অর্থের বালির বাঁধের মত যে অবস্থা হয় তা দেখা গেল। এই গল্পের মধ্যে ভূমিকম্পের মাধ্যমে জাতপাতের ব্যবধান কে এক নিমেষে মিলিয়ে দিয়েছেন ফেকুপাঁড়ে ও ইসমাইলের মৃত্যু দৃশ্যে এবং বুঝিয়ে দিয়েছেন যে এই ব্যবধান আসলে মানুষের মনে। তাই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যে কাম্য নয় এই দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের গলাগলি করে মৃত্যু দৃশ্য সেটা বুঝিয়ে দেয়। এই ভাবেই ঈশ্বর বিশ্বাস, জাতপাত প্রসঙ্গ, স্বার্থপরতা, পাপের ক্ষয়, পুণ্যের জয় ইত্যাদি নানান বিষয়কে দেখিয়েছেন। সমাজের যা কিছু অসংগতি লেখিকা দেখেছেন তাই তাঁর সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেছেন।

এছাড়াও তাঁর রচনায় সাধারন ছাঁদের ঘরোয়া জীবনের ছবি যেমন পাওয়া যায় তেমনি বিজ্ঞান নির্ভর মানসিকতা, যুদ্ধনীতি, আভিজ্ঞতারও পরিচয় মেলে। পাশাপাশি মেয়েদের শিক্ষা, মানুষের স্বার্থপরতা, হিন্দু-মুসলমান প্রেম, সতীদাহ প্রথা, পণপ্রথা, বহু বিবাহ, বিধবা বিবাহ ইত্যাদির প্রসঙ্গও দেখা যায়। তবে বিধবার বিবাহ প্রসঙ্গে তিনি সাধারণ নিম্নবিত্ত কূর্মী সমাজের মধ্যে বিধবার বিবাহ না হওয়াকেই সমস্যা হিসাবে দেখাচ্ছেন। এই সমাজের মধ্যে বিধবার বিবাহ হওয়াটাকে কেউ খারাপ চোখে দেখছে না। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক দেখিয়ে তিনি সাহসের পরিচয় দিয়েই খান্ত থেকেছেন বিবাহ বন্ধনে বাঁধার সাহস দেখাতে পারেননি। এমনকি এই হিন্দু-মুসলমান প্রেম দেখাতে গিয়ে বিধবার বিবাহও দেননি, এখানে তাঁর পুরানো ভাবধারার প্রতি আনুগত্য দেখা যায়। হিন্দু সমাজের মধ্যে অত্যাচারী স্বামীর ছবি যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি মুসলমান সমাজের মধ্যে দায়িত্ববান, মানবিক চরিত্রই বেশি দেখা গেছে। এছাড়াও প্রভুর জন্য ভৃত্যের আনুগত্য, জাত-পাতের ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন, নারী হরণ ও সতীত্ব নষ্ট, জমিদার শ্রেণীর মানুষের টাকার জোরে

কুকর্ম চাপা পরে যাবার দৃশ্য, পুলিশের শাসনের স্বরূপ ইত্যাদি নানান বিষয় তাঁর রচনায় দেখা যায়। এইভাবে রচনার মধ্যে তৎকালীন সময়, আধিকার দাবির লড়াই, প্রতিবাদ দেখা যায় তাঁর রচিত চরিত্রের কণ্ঠে। যে কণ্ঠের আবেদন আজও আমাদের সমাজ রাখে। সময়ের হিসাবে লেখা অনেক আগের হলেও বর্তমান সময়েরও উপযোগী কথা ও ভাবনা তাঁর রচনায় আমরা দেখতে পাই। এইভাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করেছেন, যা অতুলনীয়।

পরবর্তী 'শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী' এই অধ্যায়ে কেবল গল্পের বিবরণই নেই আছে আখ্যান উপাদানের কথা। শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনা সম্ভারের যে পরিসর, তা প্রাচুর্যের আতিশয্যে ভরপুর। সেই সম্ভারে আছে গল্প গ্রন্থ, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি নানাবিধ প্রকরণ। কথাসাহিত্য নিয়ে আলোচনার সূত্রে যে সমস্ত রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি তা থেকে লেখন রুচি, মেজাজ, চরিত্র যা তরতরিয়ে এগিয়ে যায়। তাঁর গদ্যরীতি অত্যন্ত সুখ পাঠ্য, সেখানে শুরু থাকলেই শেষ করার ধাপে এগিয়ে যায় মন দ্রুত গতিতে। তাঁর সাহিত্যসম্ভারে থাকা যে বিষয়গুলি এখন আমি তার গদ্যশৈলীর আলোচনায় সাজিয়েছি সেগুলি হল- চরিত্র অনুযায়ী ভাষা প্রয়োগ, শব্দদ্বিত্ব, কথন, কাহিনীকাল-কথনকাল, চরিত্র ও সংলাপ, মেয়েলি ভাষা ছাঁদ, সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার, প্রশ্নোত্তর চলনের গদ্য ব্যবহার, লোকগত উপাদানের ব্যবহার, সমান্তরাল বাক্যের চলন ইত্যাদি।

এরপর 'সমকালীন মেয়েদের লেখালিখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া' নামের আধ্যায়ে মেয়েদের একেবারে প্রথমদিকে যাঁদের হাত ধরে লেখালিখির জগতের সূচনা সেই পর্বের কয়েকজন নারীর কথা এবং তাঁর সমসাময়িক লেখিকাদের সঙ্গে ভাবনা গত তফাৎটা কোথায় সেই বিষয়টাই দেখানো হয়েছে। এই অধ্যায়টি একটু সংক্ষেপে বলে নেওয়ার চেষ্টা করব।

অন্তঃপুরের কড়া পর্দার আড়ালে কাটানো জীবনকে পিছনে ফেলে উনিশ শতকীয় নবজাগরণের আলোয় নারী যখন আলোকিত তখনই জগৎ ও জীবনকে বুঝে নেওয়ার তাগিদেই নারীর মনে জাগল শিক্ষার প্রতি আগ্রহ। তাইতো উনিশ শতকের গোড়ার দিকে খ্রিস্টান মিশনারীদের উদ্যোগে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মেয়েদের শিক্ষা বিস্তারের কথা মাথায় রেখে বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। সে সময় প্রতি ঘরে যে এই শিক্ষার আলো পৌঁছেছিল তা একেবারেই নয়। অক্ষরজ্ঞানের সঙ্গে স্বচ্ছলতার বিষয়টাও ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে ভাবে জড়িত। এছাড়াও মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে রক্ষণশীল সমাজের মনোভাব ছিল কঠোর তাইতো সেদিন ঈশ্বর গুপ্তকেই মেয়েদের পড়াশোনা করাকে ব্যাঙ্গ করে কবিতা লিখতে দেখা যায়। তবে যাই হোক সেদিন যে সমস্ত মেয়েরা এই বিদ্রূপ উপেক্ষা করে পুরুষের চোখে দেখা নারীর জীবনকে বাদ দিয়ে নিজেদের কলমে নিজেদের জীবনকে বর্ণের দ্বারা বর্ণময় করতে এগিয়ে এসেছিলেন তারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন ও চিরকাল থাকবেন। তাদের কলমের প্রতিটা বিন্দু অমরত্ব লাভ করেছে সাহিত্যের পাতায়। এইভাবে এই প্রতিকূল সময়েও যাঁরা লেখার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছেন সেই রকম কয়েকজন বিদুষী নারীর কিছু কথা এখন আমরা আলোচনার মাধ্যমে স্মরণ করার চেষ্টা করব। উনিশ শতকের হাত ধরে মেয়েদের লেখালিখির যে সূচনা বিশশতকে তার ব্যাপ্তি ঘটলেও এই সময়টা সম্পর্কে আমরা সংক্ষেপে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করব।

এক্ষেত্রে আমরা প্রথমেই সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাব ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের ফলে শুধু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নয়, ব্যাপক পরিবর্তন এসেছিল অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে নারীদের সামাজিক মর্যাদা যে উন্নত

ছিল না, এ বিষয়ে একটা ধারণা সবারই আছে। এছাড়া মেয়েদের এই অবস্থার পরিচয় রামমোহন রায় এর লেখার মধ্যেও পাওয়া যায়।

এই সময় পরিস্থিতির শিকার হয়েও যে কয়েকজন নারী নিজস্ব কাজের মধ্য দিয়ে সরবে বা নীরবে সমাজকে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাস বাসিনী দেবী, জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, স্বর্ণকুমারী দেবী উল্লেখযোগ্য। এই নামের পাশাপাশি আরও অনেকেরই নাম এই সময়ের তালিকায় এসে যায় বিষয় সংক্ষেপের কারণে যার উল্লেখ এইভাবেই অলিখিত থেকে যায়।

এরপর মেয়েরা এই সময় উত্তীর্ণ হয়ে যখন বিশ শতকের দোরগোড়ায় তখনই তারা তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা উপলব্ধীর ভিত্তিতে জীবন ও জগৎকে দেখে নিতেই নতুন পথের পথিক হয়েছিল। যুক্তির দ্বারা নারী তখন পুষ্ট। এইভাবেই নারী সেদিন বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অবস্থানকে অন্য ভাবধারায় ভাবতে শিখেছিল। উনিশ শতক থেকে বিশ শতকে উত্তরণ ভাবধারায় ব্যাপ্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিল। এই ভাবেই নারী চেতনা ও চিন্তাধারা পেল আরও উর্বর ভূমি। যে ভূমিতে নারীর মন পেল অনেকটা স্বাধীন ভাবে বিচরণের পথ। নারী মন তখন দর্শন, যুক্তি, বিজ্ঞানে আরও সমৃদ্ধ। এই প্রাপ্তি ও সমৃদ্ধিকে আঁকড়ে ধরে বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁরা যা কিছু সৃষ্টি করে গেছেন তার অবদান অসামান্য। যেন এক একটা সময়ের দলিল হয়ে অমরত্ব লাভ করেছে তাঁদের সাহিত্য। এখন আমরা এই অধ্যায়ের বিশ্লেষণে শৈলবালা ঘোষজায়ার সমসাময়িক কয়েকজন লেখিকার অভিজ্ঞতা, উপলব্ধীর কথা জেনে নেব। এই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধীর উপর ভিত্তি করে তাঁদের ভাবনার মধ্যে কতটা তফাৎ তা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করব। এ প্রসঙ্গে লেখিকার সমকালীন কয়েকজন লেখিকার

কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বেগম রোকেয়া, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, তাঁদেরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

মানব জীবন ও সমাজ জীবনকে অন্তরঙ্গভাবে জানবার ও চেনবার ক্ষেত্রই হল কথাসাহিত্য। আর এই কথাসাহিত্যের ধারায় শৈলবালা ঘোষজায়া একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি মেয়েদের শিক্ষায়, প্রতিবাদে, আর্থিক স্বাবলম্বনে, পরিবার পরিচালনায়, সন্তান লালনে ও মাতৃত্বে, কঠোরতায়, প্রেমে প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। তিনি যেভাবে তাঁর রচনায় নারীদের দেখিয়েছেন তা কতটা অভিনব সেটা বুঝতে গেলে তাঁর সমকালীন বেগম রোকেয়া, অনুরূপা দেবী, নিরূপমা দেবী, শান্তা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী প্রমুখ লেখিকাদের লেখারদিকে তাকাতে হবে। শিক্ষা, সমাজ সকল দিক থেকেই উপরিউক্ত লেখিকাদের নায়িকারা কীরকম ভাবে কাটাচ্ছে তাদের জীবনযাত্রা তা লক্ষ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসি বেগম রোকেয়ার কথায়, তিনি একটু বাকিদের থেকে সময়ের হিসাবে এগিয়ে। এই যুগের হিসাবে তিনিই প্রথম মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের কথা উপলব্ধি করেন এবং নারী-পুরুষের সমান আধিকারের কথা বলেছিলেন যা অতুলনীয়। তিনি স্বামীকে প্রভু রুপে দেখাননি, অর্ধাঙ্গ বলে দাবি জানিয়েছেন। পুরুষরা ধর্মের ভয় দেখিয়ে নারীদের শোষণ করেছে এই উপলব্ধি সত্যিই আধুনিক মনের পরিচয় দেয়। তিনিই প্রথম এই লিঙ্গ ভিত্তিক শ্রেণী শোষণের কথা বলেছিলেন। এমনকি তিনিই প্রথম ধর্ম ও সমাজের বাইরে গিয়ে নিজেকে ভারতীয় হিসাবে পরিচয় দেবার সাহস জুগিয়েছিলেন, তাঁর আগে কাউকে এভাবে ভাবতে দেখা যায় না। এইভাবে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নানান অসঙ্গতিতে রোকেয়ার প্রতিবাদ যুগের আবেদনকেও ছাড়িয়ে যায়, এইখানেই তিনি অসাধারণ।

এরপর অনুরূপা দেবীর রচনার দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাব প্রথাগত শিক্ষাকে তিনি গুরুত্ব দেননি। মেয়েদের স্কুল-কলেজে পাঠানো, পাশ করা প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি কিন্তু মেয়েদের ঘরের পড়াকেও অস্বীকার করেননি। তবে তাঁর বর্ণনাতেই মেয়েদের শিক্ষিত হওয়া মানে রামায়ণ, মহাভারত পাঠকে বুঝিয়েছেন, চিঠিপত্র লেখাকে বুঝিয়েছেন অর্থাৎ সংসার জীবনে আরও স্বাচ্ছন্দ্য ও গতি আনাতেই শিক্ষার সার্থকতা। তাইত 'জ্যোতিঃহারা' গ্রন্থের নায়িকা অনিমা শিক্ষাকে ব্যবহার করেছে নানা পরহিতকর কাজে, স্কুল স্থাপন করেছে তবে জীবনে সফলতা পায়নি এবং শেষ পর্যন্ত জীবনে সংসার ধর্মকেই আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে। নারী স্বাধীনতার বিষয়ে স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাবে এই ধারণা থেকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের মতো সমান মানসিকতা আমরা তার মধ্যে দেখি যা তাঁর রচনাতেও দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর 'পোষ্যপুত্র', 'মহানিশা', 'মা', 'মন্ত্রশক্তি', 'গরীবের মেয়ে' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে হিন্দু নারীর দাম্পত্য জীবনের আদর্শ, এবং স্বামীর প্রতি নারীর অবিচল নিষ্ঠার দিকে লেখিকা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এছাড়াও আছে দরিদ্র, নিঃসম্বল পরিবারে কন্যা সন্তান জন্মানোর পরিণাম, পণপ্রথা, নারীত্ব, সতীত্ব, মাতৃত্ব, বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ প্রভৃতি বিষয় তাঁর রচনায় দেখা যায়। এছাড়াও তিনি তাঁর নারীদের শিক্ষিত করে প্রতিষ্ঠিত না করলেও আর্থিক অসচ্ছলতা যে নারীর বঞ্চনার একটি কারণ তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেই কারণে 'মহানিশা' উপন্যাসের ধীরা চরিত্রকে বঞ্চনা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা দিয়েছেন তিনি। তবে বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ তুললেও কোন চরিত্রকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেনি এখানেই পুরানো ভাবধারাকে সমর্থন করতে দেখা গেছে।

শিক্ষা সম্পর্কে নিরুপমা দেবীর ভাবনা অনুরূপা দেবীর মতই। তাঁর রচিত 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'উচ্ছৃঙ্খল', 'দিদি', 'শ্যামলী' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে চোখ রাখলে দেখা যাবে- সমাজবিধান, রক্ষণশীলতা এবং এগুলিকে মেনে চলার প্রবণতা। নারী হয়ে জন্মানো অপরাধ, সমাজবিধানকে কেন্দ্র করে একটা পরিবারকে কিভাবে নির্যাতন করা হয় তার দৃশ্য, দরিদ্র পরিবারে কন্যার পিতার লাঞ্ছনা, সমাজপতিদের শাসনদন্ড, নারীদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও সমাজের চাপ থেকে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া প্রভৃতি বিষয় লক্ষ করা যায়। ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে পড়ে হিন্দু পরিবারে নারী শিক্ষার প্রসার কিছুটা শিথিল হয়ে আসার পরিচয় পাওয়া গেলেও লেখিকার মধ্যে দ্বিধার পরিচয় 'দিদি' উপন্যাসে দেখা যায়। সমাজবিধান অনুযায়ী বড় সন্তানের আগে না বিবাহ হলে বা বিবাহ স্থির হয়ে যাবার পর ভেঙে গেলে জাতিচ্যুত করা হবে এই বিষয় লক্ষ করা যায়। তাঁর রচনায় সমাজ বিধান অত্যন্ত ক্রিয়াশীল, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায় না, বিধবা বিবাহের প্রসঙ্গ এলেও তাঁর রচনায় তিনি এড়িয়ে যান। বিধবা বিবাহ আইন স্বীকৃত হলেও তিনি নিশ্চুপ থেকেছেন। অনুরুপা দেবীর মতোই একরকম পথেই হেঁটেছেন তিনি।

শান্তাদেবীর রচনায় শিক্ষাকে স্বনির্ভরতার, আত্ম বিকাশের পথ হিসাবে দেখা যায়। তবে শিক্ষা তাঁর সৃষ্ট নারীদের জীবনবোধকে গভীরতা দিতে পারে নি তাই শিক্ষার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের ছবি থাকলেও জীবন অন্বেষার কোনো ছবি তাঁর লেখায় নেই। শান্তাদেবী, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর থেকেও আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষায় বেড়ে উঠেছিলেন। আর এই জীবনে পরিবেশের তফাতের কারণেই শিক্ষাকে কেন্দ্র করে তাঁর ভাবনায় মৌলিক পার্থক্য। শান্তাদেবীর জীবনে পাওয়া প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ছোঁয়া তাঁর রচনায় ধরা আছে। এছাড়াও শান্তাদেবী ব্যক্তিজীবনে অরন্ধন, বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ, রাখিবন্ধনের মত

দেশপ্রেমমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর রচনায় পুত্র ও কন্যা সন্তানের মধ্যে বৈষম্য ও এই বৈষম্যকে কেন্দ্র করে কন্যা সন্তানের প্রতিবাদ প্রভৃতি বিষয় লক্ষ করা যায়। এছাড়া শিক্ষাকে নিয়ে প্রবীণদের কটাক্ষ, গ্রাম ও শহরের জীবনযাত্রার পার্থক্য, প্রেম ও বিবাহকে কেন্দ্র করে নর-নারীর মানসিক দিক, প্রচলিত প্রথাকে কেন্দ্র করে নবপ্রজন্মের প্রতিবাদ ও অভিমত, পাত্র নির্বাচনের হাতিয়ার রূপে শিক্ষা, নিজের মত অনুযায়ী বিবাহ করা, অধিক বয়সে বিবাহ, নারী-পুরুষে স্বাভাবিক মেলামেশা ও সহজ বন্ধুত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ সনাতন প্রথার বিপরীতমুখী মনোভাবই তাঁর রচনায় দেখা গেছে।

জ্যোতির্ময়ী দেবী নারীমুক্তির নির্ভুল দৃষ্টিকোণ চিনেছিলেন। তাঁর গড়া নারী চরিত্রগুলিকে বিচলিত হতে দেখা যায় নারী-পুরুষের অবস্থান-বৈষম্যে, আর্থিক স্বাধীনতাকে ভিত্তি করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে, খুঁজে নিয়েছে নিজের পথ, পুরুষ-নিরপেক্ষ ভাবে খুঁজে নিয়েছে নিজের জীবনের সংজ্ঞা। আমাদের সমাজে মেয়েদের অবস্থান যে কোথায় তাই তিনি খুঁজে চলেছেন তাঁর সাহিত্যে। মধ্যবিত্ত মেয়ের স্বনির্ভর হওয়ার প্রয়াস, বারানসীর হিন্দু বিধবার অসহায়তা, রাজস্থানের নির্যাতিতা নারীর বেদনা, পতিতালয়ের নারীর জীবন এই রকম বিচিত্র টুকরো ছবি স্থান পেয়েছে তাঁর রচনায়। এছাড়াও দেশভাগ ও মন্বন্তরের মত রাজনৈতিক অভিঘাতের কবলে পড়ে নারীর যন্ত্রণার চিত্রও তাঁর লেখায় স্পষ্ট। জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনার স্বাতন্ত্র্য আরও এক জায়গায় শিক্ষা তাঁর নায়িকাদের কাছে পুরুষের যোগ্য সঙ্গিনী হবার জন্য নয়, নিজেদের প্রয়োজন ও নিজেদের পূর্ণতার জন্য তাদের শিক্ষা। এছাড়া তাঁর স্বাতন্ত্র্যতা চোখে পড়ে অন্য অরেকটি ক্ষেত্রে, তাঁর নায়িকারা সকলেই শান্তভাবে, জীবনের মার সহ্য করতে করতে নিজেদের সঙ্কল্পের পথে এগিয়ে যায়। তাঁর সুতারা, সুপ্রিয়া, বীনা সবাই খোঁজে নারীর এক নতুন পরিচয়, নারীত্বকে ছাপিয়ে পৌঁছে যায় মানুষ পরিচয়ে।

শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার প্রধান বিষয়ই হল অবহেলিত, বঞ্চিত ও অবদমিত নারীসমাজ। সমাজে নারী-পুরুষের বৈষম্যকে তিনিও দেখান। এছাড়াও সংসারে পুরুষের কর্তৃত্ব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধর্ম, জীবনযাপন প্রণালী প্রভৃতি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে অসাম্য, ধর্ম, মেয়েদের বেশি বয়সে বিবাহ, চাকরি, বাইরে যাওয়া অর্থাৎ বাইরের জীবনকে দেখার আকাঙ্খা, বুদ্ধিমত্তার জোরে আত্মপ্রতিষ্ঠা, সাধুদের কপটাচারের বিরুদ্ধতা, জাতপাত সমস্যা, সমাজে নারীর অবস্থান প্রভৃতি দিকগুলি তাঁর রচনায় দেখা যায়। তাঁর রচিত ‘সেখ আন্দু’, ‘ঘৃণাহতা’, ‘জন্ম-অভিশপ্তা’, ‘অভিশপ্ত সাধনা’, ‘তেজস্বতী' প্রভৃতি রচনাগুলির মধ্যেই উপরিউক্ত বিষয়গুলি দেখতে পাওয়া যায়। এছাড়াও পিতৃতন্ত্রের দম্ভ ‘জামাইবাবু’ নামক গল্পের জামাইবাবু চরিত্রের মধ্যে দিয়ে দেখা যায়, সেখানে মেয়েদের শক্ত শাসনে রাখার কথা বলা হয়েছে, যেখানে পুরুষের দৃষ্টিতে মেয়েরা আলাদা জাত বলে চিহ্নিত হয়েছে। মেয়েদের সম্মানটা কোথায় সে প্রশ্নের উত্তরে যেন এক নারীবাদী আন্দোলনেরই ডাক দিয়ে গেছেন যা পাঠক সমাজের কাছে নতুন রুপে ধরা দেয়। নারীর শিক্ষাকে প্রাধান্য দিয়েও শিক্ষিতা, চাকুরীরত নারীর উপরও অত্যাচার হওয়ার ছবি দেখিয়েছেন ‘জন্ম আভিশপ্তা’ উপন্যাসে।

আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী না হওয়া নারীকেও একই সমস্যায় পড়তে দেখা গেছে ‘অরু’ উপন্যাসে। এখানে স্বামীর মৃত্যুর পর বৈধব্য প্রাপ্তির মধ্যে দিয়ে নারীকে এসব সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে দেখা গেছে, সবশেষে শিক্ষার মাধ্যমে জীবনে বেঁচে থাকার পথ পেতে দেখা য়ায়। এছাড়াও ‘বিনীতাদি’ উপন্যাসে শিক্ষিতা নারীকে মুক্ত ভাবে থাকতে চাওয়ার জন্য বিয়ে না করে একা থাকার পথ বেছে নিতে দেখা যায়। এভাবে নারীকে বিবাহ, ঘরের কাজে আটকে না রেখে স্বাধীন, স্বনির্ভর করে দেখিয়েছেন। ‘গঙ্গাপুত্র’ উপন্যাসে লালু নামের ডোম চরিত্র, যাকে তার কাজের জন্য এক ব্রাহ্মন অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়েছে, এইভাবেই ব্রাহ্মনের

থেকেও মহৎ করে তোলার মধ্যে দিয়ে সেইসময়ের হিসাবে যেন এক আলাদা ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়ে অভিনবত্ব দেখিয়েছেন। এছাড়াও 'সেখ আন্দু' যে সময় লিখছেন সেখানেও মুসলমান যুবক আন্দু ও হিন্দু বিধবার প্রেম এবং হিন্দু মনিবের পরিবারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক দেখিয়ে সে সময় জাতপাতের উর্দ্ধে গিয়ে মানবতাকে বড় করে তুলেছেন, পাশাপাশি বিধবার মধ্যে প্রেমের অনুভূতি থাকলেও তাদের বিয়ের দৃশ্য না দেখানোর মধ্যে দিয়ে পুরানো ধারণাকে প্রাধান্য দেওয়ার মনোভাব দেখা যায়। তবে বিধবা বিবাহের ক্ষেত্রে তাঁর উপলব্ধি থেকে প্রান্তিক নিম্নবর্ণের জীবন যাত্রায় বিধবার বিবাহকে অনেকটা সহজ করে দেখিয়েছেন, তাই তাঁর ভাবনার মধ্যে বিধবার বিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। এসবকিছু ভাবনা তাঁর থাকলেও বিধবাকে কোথাও তিনি নিয়মপালনের গণ্ডিতে বাঁধেননি। এখানেও তিনি দেখার দিক থেকে একটা আলাদা মাত্রা পেয়ে যান। এইভাবেই মেয়েদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক স্বাধীনতা, মানবতা, জ্যোতিষ বিদ্যার প্রতি বিশ্বাস, মানুষ-মানুষে বিরোধ, পাহাড়ি মানুষের জীবনযাত্রা, লেখালিখি করতে নানান বাধাবিপত্তি, টাকার দাপটে জমিদার শ্রেণীর মানুষের কুকর্ম চাপা পড়ে যাবার ঘটনা, সমাজে পুলিশের ভুমিকার বাস্তব চেহারা প্রভৃতি সাহিত্যে তুলে ধরেছেন, যা তাঁর সময়ের থেকে অনেক এগিয়ে। এইভাবেই তাঁর লেখা স্বমহিমায় স্বাতন্ত্র্যতা লাভ করেছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি মূল অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকবে। সবশেষে রয়েছে উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি।

উপসংহার

'শৈলবালা ঘোষজায়ার কথাসাহিত্য (নির্বাচিত): একটি মূল্যায়ন'– নামক অভিসন্দর্ভটি যেভাবে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায় ভিত্তিক ভাবে সেজে উঠেছে তা নিম্নরূপ-

ভূমিকা, লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ-কাল-পটভূমি, সাহিত্যকৃতির দুই ধারা, শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী, সমকালীন মেয়েদের লেখালিখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া, উপসংহার ও গ্রন্থপঞ্জি। প্রত্যেকটা অধ্যায়ের কথা শেষে এখন সিদ্ধান্তের উপস্থাপনা পর্ব। এই সূত্রে প্রতিটা অধ্যায়ের কিছু কথা বলে নেবার পালা।

প্রথম অধ্যায় 'লেখিকার ব্যক্তিজীবন ও দেশ–কাল–পটভূমি' এখানে লেখিকার সময়কালের রাজনৈতিক পরিসর, মেয়েদের রাজনীতিতে বাড়ির বাইরের কর্মকান্ড, মেয়েদের শিক্ষা লাভের কথা, ভোটদানের প্রয়োজনীয়তা, মেয়েদের জীবনচর্যা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি নানান বিষয়কে দেখানো হয়েছে। এই সূত্রে এই সময়কার কিছু ঘটনা যা তাঁর মনকে নাড়া দেয় সেরকম দৃশ্যও সাহিত্যে প্রকাশ করতে দেখা যায়। তাই সাহিত্য ও সমাজ যেন মিলেমিশে একাকার।

দ্বিতীয় অধ্যায় 'সাহিত্যকৃতির দুই ধারা'- শিক্ষামূলক রচনা, সমাজ কেন্দ্রিক রচনা। শিক্ষামূলক রচনার মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা, যুক্তিপূর্ণ কথা বলা ও সাবলম্বী হওয়ার ছবি দেখা যায়। এছাড়াও শিক্ষাকে বেছে নিয়ে নারী কখনও যুক্তিবাদী কখনও স্বনির্ভর। তবে স্বনির্ভর হয়েও নারীকে স্বামীর অত্যাচারের শিকার হতেও দেখা যায়। পাশাপাশি শিক্ষিত নারী লেখাকে পেশা হিসেবে বেছে নিলে তাকেও এক ঘরে করে রাখার মত ঘটনা আমরা পেয়েছি তাঁর সাহিত্যে।

শিক্ষার পাশাপাশি আসে সমাজের বিভিন্ন দিক যেমন- জাতির ভিত্তিতে পেশা নির্বাচন, ধর্মগুরু স্থানীয় মানুষের সান্নিধ্যে বিপদে পড়ার মতো ঘটনা, নারী হরণ, সতীত্ব নষ্ট ও খুনের দৃশ্য, টাকা দিয়ে জমিদার শ্রেণীর মানুষের কুকর্ম চাপা পড়ে যাবার বিষয়, ইমানদারীর প্রসঙ্গ, পাপ–পূণ্য ভাবনা, সমাজে পুলিশ –এর ভূমিকার প্রসঙ্গ প্রভৃতি দেখা যায়।

তৃতীয় অধ্যায় 'শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনার গদ্যশৈলী'– এখানে যে সমস্ত বিষয়কে উপস্থাপনা করে দেখিয়েছি তা একেবারে অন্যরকম। শৈলবালা ঘোষজায়ার রচনা সম্ভারের যে পরিসর, তা প্রাচুর্যের আতিশয্যে ভরপুর। সেই সম্ভারে আছে গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি নানাবিধ প্রকরণ। তাঁর গদ্যরীতি অত্যন্ত সুখ পাঠ্য, সেখানে শুরু থাকলেই শেষ করার ধাপে এগিয়ে যায় মন দ্রুত গতিতে। তাঁর সাহিত্যসম্ভারে থাকা গদ্যশৈলীর যে সমস্ত উপাদানে এ অধ্যায়টি অন্যরূপ লাভ করে, সেগুলি আলোচনায় সাজিয়েছি তা হল নিম্নরূপ- চরিত্র অনুযায়ী ভাষা যোজনা, শব্দদ্বিত্বের ব্যবহার, মেয়েলি ভাষা ছাঁদ, সাঙ্কেতিক ভাষার ব্যবহার, প্রশ্নোত্তর চলনের গদ্য ব্যবহার, কথন, কথনকাল-কাহিনীকাল, চরিত্র ও সংলাপ, লোকগত উপাদানের ব্যবহার, সমান্তরাল বাক্যের চলন।

সবশেষে 'সমকালীন মেয়েদের লেখালেখির জগৎ ও শৈলবালা ঘোষজায়া' এই অধ্যায়ে সমকালীন অন্যান্য লেখিকাদের সঙ্গে কোথায় মতের মিল ও কিভাবে তিনি দেখেছেন সেই বিষয়টা দেখানো হয়েছে। এখানে সমকালীন কয়েকজন লেখিকা যাঁদের কিছু ভাবনা দেখিয়েছি, তাঁরা হলেন- বেগম রোকেয়া, অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, জ্যোতির্ময়ী দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী। উনিশ শতকের হাত ধরে মেয়েদের লেখালিখির যে সূচনা বিশশতকে তার ব্যাপ্তি তাই এই সময়ে মেয়েদের লেখালিখি নিয়ে ব্যাঙ্গ বিদ্রূপের ছবিও দেখেছি। এছাড়াও সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেও নারী ছিল পিছিয়ে। এই সময় পরিস্থিতির

শিকার হয়েও যে কয়েকজন নারী নিজস্ব কাজের মধ্য দিয়ে সরবে বা নীরবে সমাজকে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন তাঁদের মধ্যে রাসসুন্দরী দেবী, কৈলাস বাসিনী দেবী, জ্ঞানদা নন্দিনী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, স্বর্ণকুমারী দেবী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁদের দেখানো পথেই পরবর্তী কালে নারীরা পেয়েছিল এগিয়ে চলার সাহস।

যখন বিশ শতকের দোরগোড়ায় নারী উত্তীর্ণ তখনই তারা তাদের অর্জিত অভিজ্ঞতা-উপলব্ধীর ভিত্তিতে জীবন ও জগৎকে নতুনভাবে দেখে নিতে চেয়েছিল। যুক্তির দ্বারা নারী তখন পুষ্ট। এইভাবেই নারী সেদিন বিভিন্ন পরিস্থিতি ও অবস্থানকে অন্যভাবে দেখতে শিখে ভাবধারায় এনেছিল ব্যাপ্তি। নারী চেতনা ও চিন্তাধারা তখন পেয়েছিল আরও উর্বর ভূমি। যে ভূমিতে নারীর মন পেল অনেকটা স্বাধীন ভাবে বিচরণের পথ। নারী মন তখন দর্শন, যুক্তি, বিজ্ঞানে আরও সমৃদ্ধ। এই প্রাপ্তি ও সমৃদ্ধিকে আঁকড়ে ধরে বাংলা সাহিত্য জগতে তাঁরা যা কিছু সৃষ্টি করে গেছেন তার অবদান অসামান্য। এইভাবে নারীর নিজস্ব পরিসর খুঁজে নেওয়ার তাগিদে এসময় অনেকে লেখালিখি করেছিলেন তাদের প্রত্যেকের নাম সাহিত্যে মর্যাদা লাভ করেছে।

লেখিকার রচনার মাধ্যমে সমাজ, শিক্ষা যেমন দেখতে পেয়েছি তেমনই অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর ভাবনার তফাৎও দেখা গেছে। পাশাপাশি গদ্যশৈলীতে পটভূমি ও চরিত্রের নিরিখে ভাষা বৈচিত্র, লোকগত উপাদানের মাধ্যমেও সমাজকে দেখতে পাওয়া যায়। এইভাবেই লেখার মধ্যে সে যুগের সময়ের ছাপ আমরা যেমন পাই, তেমনই বর্তমান সময়েরও তাৎপর্য রেখে যায়। লেখার মাধ্যমেই তিনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করেছেন। এই সমৃদ্ধ সাহিত্যের আলোচনার হাত ধরে শুরু থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো পর্যন্তই হল আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভের ইতিকথা।

গ্রন্থপঞ্জি

ক। আকর গ্রন্থ -

১। অরুন মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), ১৪২৬ ব, শৈলবালা ঘোষজায়া সেরা পাঁচটি উপন্যাস, কলকাতা, মিত্র ঘোষ।

২। শৈলবালা ঘোষজায়া, ২০১৭, শেখ আন্দু, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন।

৩। শৈলবালা ঘোষজায়ার গল্প সংকলন, ২০০০, কলকাতা, দে'জ ।

৪। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, আশ্বিন ১৩২৮ ব, জন্ম-অভিশপ্তা, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

৫। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, (বৈশাখ ১৩২৬ - ফাগুন ১৩২৭) ইমানদার, ভারতবর্ষ পত্রিকা।

৬। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, করুণা দেবীর আশ্রম, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

৭। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, চৈত্র ১৩২৯, অকাল কুষ্মাণ্ডের কীর্তি, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

৮। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, তেজস্বতী, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

৯। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, ফাল্গুন ১৩৩১ ব, অবাক, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

১০। শ্রী শৈলবালা ঘোষজায়া, রঙীন ফানুস, কলকাতা, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স।

খ। সহায়ক গ্রন্থ –

১। অনামিকা চক্রবর্তী, বইমেলা ২০১৪, জ্যোতির্ময়ী দেবী জীবন ও সাহিত্য, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২। অমিতাভ দাস, মার্চ ২০১৪ আখ্যানতত্ত্ব, কলকাতা, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স।

৩। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.), শ্রাবণ ১৪০৮, বিংশ শতাব্দীর নারী-ঔপন্যাসিক, কলকাতা, পূর্বা।

৪। অরুন্ধতী সুর (রায়), জুলাই ২০১১, নারীর কলমে নারীর কণ্ঠ : আইন এবং সমাজ-বিধান, কলকাতা, সহযাত্রী।

৫। অরূপ আচার্য (সম্পা.), জানুয়ারী ২০০৬, একান্তর একাদশী, কলকাতা, একান্তর।

৬। অলোক রায়, জানুয়ারি ২০১৬, বিশ শতক, কলকাতা, প্রমা প্রকাশনী।

৭। আশিসকুমার দে, জানুয়ারি ১৯৯২, সাহিত্যালোচনা ও শৈলীবিজ্ঞান, কলকাতা, সাহিত্য প্রকাশ।

৮। ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, এপ্রিল ২০২৪, প্রবাদের খইচুবড়ি, কলকাতা, মান্দাস।

৯। উদয় চাঁদ দাস, ফেব্রুয়ারি ২০০৯, আখ্যানের সম্প্রসারণ : উনিশ শতক বিশ শতক, বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

১০। উপেন কিসকু (সম্পা.), ভাদ্র ১৪০৫, লোকশ্রুতি, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র।

১১। কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, এপ্রিল ২০০৯, নারী শ্রেণী ও বর্ণ, কলকাতা, মিত্রম্।

১২। গোলাম মুরশিদ, জানুয়ারি ২০০১, নারী প্রগতি : আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমনী, কলকাতা, নয়া উদ্যোগ।

১৩। গোলাম মুরশিদ, বইমেলা ২০১৩, নারী প্রগতির একশো বছর : রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া, ঢাকা, অবসর।

১৪। চিত্রিতা বন্দ্যোপাধ্যায় (রায়), আগস্ট ২০০৪, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী।

১৫। ড. অরুণকুমার বসু, বৈশাখ ১৩৮৮, বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা, কলকাতা, সমতট প্রকাশনী।

১৬। ড. জয়ন্তী মন্ডল, সেপ্টেম্বর ২০১৪, উনবিংশ শতাব্দীর স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, দে পাবলিকেশনস।

১৭। ড. মাধবী দে, এপ্রিল ২০০৩, শান্তা দেবী ও সীতা দেবী, কলকাতা, সাহিত্যলোক।

১৮। ড. শীলা বসাক, মার্চ ১৯৯৮, বাংলা ধাঁধার বিষয়বৈচিত্র ও সামাজিক পরিচয়, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

১৯। তপতী ভট্টাচার্য, এপ্রিল ২০০৯, প্রতীচ্য ভাবনা ও বঙ্গীয় নারী জাগরণ, কলকাতা, অরুণা প্রকাশন।

২০। তপোধীর ভট্টাচার্য, জানুয়ারী ২০০৭, নারীচেতনা : মননে ও সাহিত্য, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

২১। দূর্বা দেব, বইমেলা ২০০৭, আত্মজীবনীর স্থাপত্য, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ।

২২। দেবাশিস বসু, বইমেলা ২০১০, বাংলা ছড়ায় সমাজ ভাবনা, কলকাতা, একুশ শতক।

২৩। পবিত্র সরকার, মাঘ ১৩৯১, গদ্যরীতি পদ্যরীতি, কলকাতা, সাহিত্যলোক।

২৪। পবিত্র সরকার, বৈশাখ ১৪১০, লোকভাষা লোকসংস্কৃতি, কলকাতা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

২৫। পরেশচন্দ্র মজুমদার ও অভিজিৎ মজুমদার, পৌষ ১৪১৬, বাঙলা সাহিত্যপাঠ : শৈলীগত অনুধাবন, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

২৬। পায়েল বসু, মাঘ ১৪২৯, আঁকা ছবি লেখা ছবি, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং।

২৭। পুলক চন্দ (সম্পা.), জুলাই ২০০৮, নারীবিশ্ব, কলকাতা, গাঙচিল।

২৮। প্রসুন ঘোষ ও অহনা বিশ্বাস (সম্পা.), সেপ্টেম্বর ২০১৮, অন্দরের ইতিহাস : নারীর জবানবন্দী, কলকাতা, গাঙচিল।

২৯। বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), নভেম্বর ২০১১, নারীপৃথিবী : বহুস্বর, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন।

৩০। ভব রায়, বৈশাখ ১৪০৮, বাংলার লোকবৃত্ত ও লোকসংস্কৃতি বিচিত্রা, কলকাতা, জয়দুর্গা লাইব্রেরী।

৩১। ভারতী রায় (সম্পা.), জানুয়ারি ২০১৬, প্রবাসী- তে নারী, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৩২। ভারতী রায় (সম্পা.), ডিসেম্বর ২০১৪, নারী ও পরিবার : বামাবোধিনী পত্রিকা, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৩৩। মফিদুল হক, ২০০৯, নারীমুক্তির পথিকৃৎ, কলকাতা, কথা।

৩৪। মৈত্রেয়ী চট্টোপাধ্যায়, জানুয়ারি ১৯৯৯, বাঁধন ছেঁড়ার সাধন, কলকাতা, প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্।

৩৫। যশোরধরা বাগচী, মার্চ ২০১২, নারী ও নারীর সমস্যা, কলকাতা, অনুষ্টুপ।

৩৭। রাজশ্রী বসু ও বাসবী চক্রবর্তী (সম্পা.), জুন ২০০৮, প্রসঙ্গ : মানবীবিদ্যা, কলকাতা, উর্বী প্রকাশন।

৩৮। শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত, মে ২০০৭, পথের ইঙ্গিত, কলকাতা, স্ত্রী।

৩৯। শিশিরকুমার দাশ, বৈশাখ ১৪১৭, ভাষাজিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্যাপিরাস।

৪০। শুক্লা ঘোষাল (সম্পা.), জুন ২০১৫, বঙ্গে নারী নির্যাতন ও নারীর উত্থান, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স।

৪১। শ্যামলী বসু, ২০১৮, সেকাল ও সেকালিনী, কলকাতা, সুবর্ণরেখা।

৪২। শ্রী পবিত্র সরকার (সম্পা.), ফেব্রুয়ারি ২০০১, ভারতের সমাজ ভারতের নারী, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৪৩। শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাঘ ১৩৫৭ ব, বঙ্গসাহিত্যে নারী, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

৪৪। সঞ্চয়িতা পাল চক্রবর্তী ও পৃথা কুন্ডু, জানুয়ারি ২০১৯, অনন্যাদের আখ্যান : ভাবনা–কর্মে বাঙালি নারী, কলকাতা, গাঙচিল।

৪৫। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৌষ ১৪০৯ ব, উনিশ - বিশের কড়চা, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।

৪৬। সর্বাণী রায়, সেপ্টেম্বর ২০০২, মানুষ, প্রকৃতি ও প্রাণীজগৎ লোকসংস্কৃতির দর্পণে, কলকাতা, পুস্তক বিপণি।

৪৭। সিদ্ধার্থ বসু, বইমেলা ২০১৯, সেকালের নারীদের জীবন ও তাদের চেতনা, কলকাতা, সুরঙ্গমা।

৪৮। সুতপা ভট্টাচার্য, আগস্ট ২০১২, মেয়েলি আলাপ, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

৪৯। সুতপা ভট্টাচার্য, জানুয়ারি ২০০০, মেয়েলি পাঠ, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

৫০। সুতপা ভট্টাচার্য, জুলাই ২০১৮, মেয়েদের স্মৃতিকথা, কলকাতা, সিগনেট প্রেস।

৫১। সুতপা ভট্টাচার্য, ডিসেম্বর ২০০৩, মেয়েদের লেখালেখি, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

৫২। সুদক্ষিণা ঘোষ, ২০১৬, জ্যোতির্ময়ী দেবী, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি।

৫৩। সুদক্ষিণা ঘোষ, ২০১৮, স্বর্ণকুমারী দেবী, কলকাতা, সাহিত্য অকাদেমি।

৫৪। সুদক্ষিণা ঘোষ, মাঘ ১৪১৪ ব, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা : 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্ণলতা', কলকাতা, দে'জ।

৫৫। সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.), মার্চ ২০১০, মেয়েদের কথাকল্প, কলকাতা, অক্ষর প্রকাশনী।

৫৬। সুনন্দা সিকদার, নভেম্বর ২০১২, দয়াময়ীর কথা, কলকাতা, গাঙচিল।

৫৭। স্বপন বসু ও হর্ষ দত্ত (সম্পা.), সেপ্টেম্বর ২০২০, বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা, পুস্তক বিপনি।

৫৮। হুমায়ুন আজাদ, ফাল্গুন ১৪২২, নারী, ঢাকা, আগামী প্রকাশনী।

৫৯। Chatman, Seymour (ed), 1971, Literary Style : A symposium, London & New York, Oxford University Press

৬০। -1978, Story and Discourse : Narrative Structure in Fiction and Film, Ithaca & London, Cornell University Press

৬১। Cobley, Paul, 2001, Narrative, London & New York, Routledge

৬২। Lewis, C. Day, 1947, The Poetic Image, London, Jonathan Cape

৬৩। Stanzel F. K, 1988, A Theory of Narrative, Trans. C. Geoedsche, Cambridge, New York & Melbourne, Cambridge University Press

গ। পত্রিকাপঞ্জি-

১। অধ্যাপক আনন্দদেব মুখোপাধ্যায় (সম্পা.), আগস্ট ২০১২, মঞ্জুলা বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা, কলকাতা, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ।

২। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য (সম্পা.), বৈশাখ - আষাঢ় ১৪২২, বিশ্বভারতী পত্রিকা, কলকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

৩। উৎপল ঝা, শ্রাবণ ১৪২২, সাহিত্য–পরিষৎ–পত্রিকা, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

৪। ড. মীরাতুন নাহার (সম্পা.), জানুয়ারী ২০০০, লুকানো রতন, কলকাতা, সুরাহা-সম্প্রীতি।

৫। তাপস ভৌমিক (সম্পা.), ২০১৪ বইমেলা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা : বাংলা আত্মজীবনী ও স্মৃতিকথা সংখ্যা, কলকাতা, কোরক।

৬। তাপস ভৌমিক (সম্পা.), ২০১৭ বইমেলা, কোরক সাহিত্য পত্রিকা : লেখিকাদের লেখালেখি, কলকাতা, কোরক।

৭। দীপঙ্কর মল্লিক (সম্পা.), আশ্বিন ১৪২০, তবু একলব্য, কলকাতা, দিয়া পাবলিকেশন ।

৮। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), মে ২০১০, পরিকথা : বিস্মৃত বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, শৈলী।

৯। রফিকউল্লাহ খান ও অমিতাভ চক্রবর্তী (সম্পা.), আগস্ট২০১৯, বীক্ষা : বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা, দিল্লী, বাংলা একাডেমি ট্রাস্ট।

১০। শ্রী অরুন কুমার গুপ্ত (সম্পা.), আগস্ট ২০০৩, মঞ্জুলা বিশ্বাস স্মারক বক্তৃতা, কোলকাতা, বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ।

১১। শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), জ্যৈষ্ঠ ১৩২১, বামাবোধিনী পত্রিকা, ৯ নং আন্টনিবাগান লেন, ইন্ডিয়ান প্রেস।

১২। শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, বামাবোধিনী পত্রিকা, ৯ নং আন্টনিবাগান লেন, ইন্ডিয়ান প্রেস।

১৩। শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), আশ্বিন ১৩১৪, বামাবোধিনী পত্রিকা, ৯ নং আন্টনিবাগান লেন, ইন্ডিয়ান প্রেস।

১৪। শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), ভাদ্র ১৩১৪, বামাবোধিনী পত্রিকা, ৯ নং আন্টনিবাগান লেন, ইন্ডিয়ান প্রেস।

১৫। শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত (সম্পা.), মাঘ ১৩১৪, বামাবোধিনী পত্রিকা, ৯ নং আন্টনিবাগান লেন, ইন্ডিয়ান প্রেস।

১৬। সুবল সামন্ত (সম্পা.), শারদীয় ১৪২৫, এবং মুশায়েরা : নারী ঔপন্যাসিক সংখ্যা, কলকাতা, এবং মুশায়েরা।

১৭। সুবিমল মিশ্র, আষাঢ় ১৪১৯, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

১৮। পুলককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সেপ্টেম্বর ২০১৮, আনন্দবাজার পত্রিকা রবিবাসরীয়, কলকাতা,

ঘ। বৈদ্যুতিন তথ্য-

১।
https://www.boishakhionline.com/659/%E0%A6%B6%E0%A7%88%E0%A6%B2%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B2%E0%A6%BE-%E0%A6%98%E0%A7%8B%E0%A6%B7%E0%A6%9C%E0%A6%BE%E0%A7%9F%E0%A6%BE%E

Countersigned by the supervisor: Candidate:

Dr. Payel Basu Rinku Roy

Dated: Dated: